প্রকাশ করে ও অন্যবস্তুর প্রকাশেও সাহায্য করে। কতকগুলির গুণের সমষ্টি **এই বুদ্ধি,** যেমন **জ্ঞান, ধর্ম, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য।** কিন্তু এই বুদ্ধি যখন তমোগুণের দ্বারা দূষিত হয়, তখন সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হয়, ফলে কতকগুলি **অসৎগুণ** যেমন, **অজ্ঞান, অধর্ম, অশক্তি ও আসক্তি বুদ্ধিকে** আবৃত করে। এই বুদ্ধি মানুষের সমস্ত বৌদ্ধিক কাজকর্মের উৎস স্বরূপ।

(১) বুদ্ধি

মহৎ অথবা বুদ্ধি থেকে অহংকারের সৃষ্টি। **অভিমান অহংকারের বৈশিষ্ট্য।** জগতের বিভিন্ন বস্তু সম্পর্কে আমাদের মনোভাবকে চিহ্নিত করে এই অহংকার। 'এটা আমার', 'এই কাজ আমি করলাম'—ইত্যাদি বলার সময় অহংকারের প্রকাশ হয়। গুণের অনুপাতিক বৈষম্যের দরুন অহংকার তিন ধরনের—সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস। সাত্ত্বিক অহংকার থেকে **পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, ও মন** উৎপন্ন হয়, **তামস গুণ থেকে পাঁচটি তন্মাত্রা অর্থাৎ** শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, রূপ, রসের সূক্ষ্মরূপ। এই **পাঁচটি তন্মাত্রা থেকে পাঁচটি মহাভূতের সৃষ্টি** (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম)। রাজস গুণ এই দুই গুণের বিভিন্ন কাজে, এদের পরিবর্তনে সহায়তা করে, এদের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করে। **পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় হ'ল**—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক। **পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়** হ'ল—বাক্ পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ। **মন হ'ল এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্র।** সব ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মন যুক্ত হতে পারে। মনের নির্দেশ ছাড়া কোন জ্ঞান আহরণ সম্ভব নয়। **মন, বুদ্ধি ও অহংকারকে একত্রে অন্তঃকরণ বলা হয়।**

(২) অহংকার

সাত্ত্বিক অহংকার থেকে ৫টি জ্ঞানেন্দ্রিয়, ৫টি কর্মেন্দ্রিয় ও মন—তামস অহংকার থেকে ৫টি তন্মাত্রা ও পঞ্চভূত

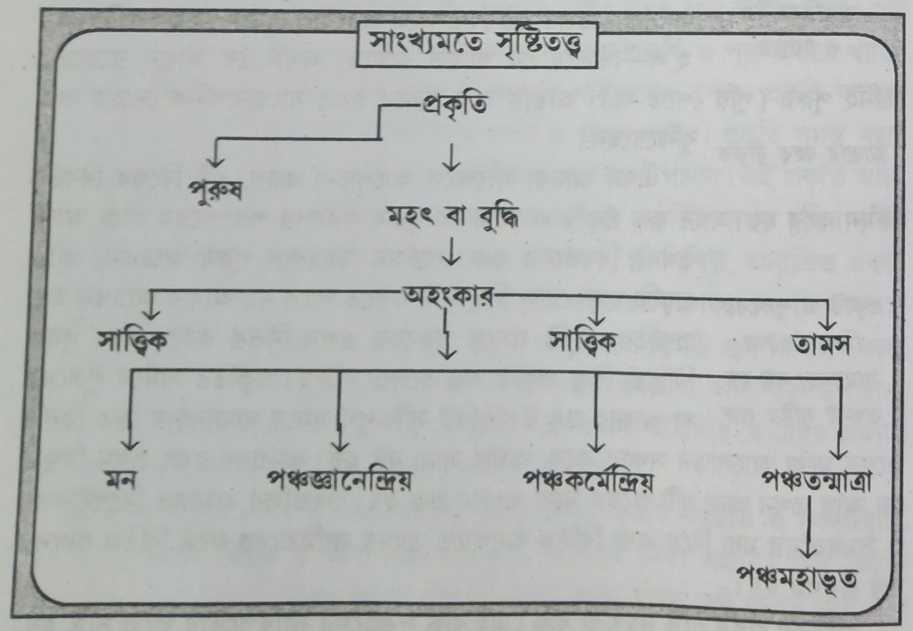

এইভাবে **আত্মন্ ও জড়বস্তু** মিলে **স্থূল, সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর** বস্তুর বিবর্তন ঘটায়।

সাংখ্যমতে প্রকৃতির বিবর্তনের ফলে বস্তু উৎপন্ন হয়। আত্মা দোষগুণ অনুসারে কর্মফল ভোগ করে। প্রকৃতির বিবর্তনের মধ্য দিয়েই আত্মার মুক্তিলাভ। **তত্ত্বজ্ঞান** লাভ হলেই আত্মা মুক্ত হয়।

➤ সাংখ্যমতে জ্ঞানতত্ত্ব (Epistemology) ➤

সাংখ্যদর্শন প্রমার তিনটি উৎসকে স্বীকার করে, এগুলি হ'ল—**প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ।**

সাংখ্যদর্শনে প্রমা কোন বস্তুর বিশেষ ও সত্যজ্ঞান। সাংখ্য এই জানার প্রক্রিয়াকে একটু অন্যভাবে বিশ্লেষণ করে। সব প্রমার তিনটি উপাদান আবশ্যিক অঙ্গ—একটি হ'ল **প্রমাতা,** যে জানছে, দ্বিতীয়টি হ'ল **প্রমেয়,** অর্থাৎ যা জানা যাচ্ছে, আর **জানার উৎস হ'ল প্রমাণ।** বুদ্ধির আত্মাতে বিষয়াকারে যে প্রতিফলন হয়, তাই প্রমাণ। সাংখ্যদর্শনে বুদ্ধি অচেতন। সেই বুদ্ধি যখন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, তখন বিষয়ের আকার ধারণ করে এবং ঐ আকারে রূপায়িত বুদ্ধি চৈতন্যস্বরূপ আত্মাতে প্রতিফলিত হয়, তখনই প্রমা বা সত্যজ্ঞান সম্ভব। এই **জানা কয়েকটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সম্ভব হয়—প্রথমত, ইন্দ্রিয় বস্তুর সংস্পর্শে আসে, দ্বিতীয়ত এই সংযোগের ফলে ইন্দ্রিয়গুলিতে একটি ছাপ (impression) পড়ে। তৃতীয়ত, মন, বুদ্ধি একে বিশ্লেষণ করে। চতুর্থত, বুদ্ধি যে স্বরূপত অচেতন, তাই বিষয়টিকে সরাসরি জানতে পারে না, কিন্তু বিষয়ের আকারে আকারিত হয়। বুদ্ধিতে সাত্ত্বিক গুণ থাকার ফলে তা আত্মার চেতন অংশে প্রতিফলিত হয়, ও শেষে বুদ্ধির প্রতিফলনের সাহায্যে আত্মা বস্তুটিকে জানে।**

জানার প্রক্রিয়া

(১) ইন্দ্রিয় বস্তু সংযুক্ত

(২) ইন্দ্রিয়তে ছাপ

(৩) মন ও বুদ্ধির দ্বারা এদের বিশ্লেষণ

(৪) বুদ্ধি বস্তুর আকার ধারণ করে (৫) চেতন অংশে বুদ্ধি প্রতিফলিত হয় তখন জানা সম্ভব

➤ প্রত্যক্ষ ➤

প্রত্যক্ষ দুধরনের—নির্বিকল্প ও সবিকল্প।

নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় ও বস্তুর সংযোগ থেকে উৎপন্ন হয়। এই প্রত্যক্ষ একেবারেই **সংবেদন (sensation), বাক্যে একে প্রকাশ করা যায় না।** এই অবস্থাকে **আলোচনা** বলা হয়। শিশুর যেমন বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে সংবেদন হয়, কিন্তু প্রকাশ করতে পারে না বিষয়টির নির্দিষ্ট স্বরূপ, তেমনি নির্বিকল্প প্রত্যক্ষেও শুধু সংবেদন হয়। দ্বিতীয় অবস্থা হ'ল সবিকল্প প্রত্যক্ষ। এই প্রত্যক্ষে বিষয়টি সম্পর্কে জ্ঞাতার পূর্ণ জ্ঞান হয়, তখন সে বলতে পারে—'এটি একটি টেবিল', 'এটি বই' ইত্যাদি।

প্রত্যক্ষ দুধরনের নির্বিকল্প ও সবিকল্প

জ্ঞানের দ্বিতীয় উৎস হল অনুমান। সাংখ্যদর্শন মতে কার্যকারণের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের সূত্র ধরে আমরা প্রত্যক্ষ থেকে অপ্রত্যক্ষে পৌঁছাই। উদাহরণ স্বরূপ, আমরা আগুন ও ধোঁয়ার একটি অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক সব সময় দেখেছি। তাই যখনই ধোঁয়া দেখছি তখনই আগুনের অস্তিত্ব অনুমান করছি। এই অনুমান সদর্থক ও নেতিবাচক হ'তে পারে।

অনুমান

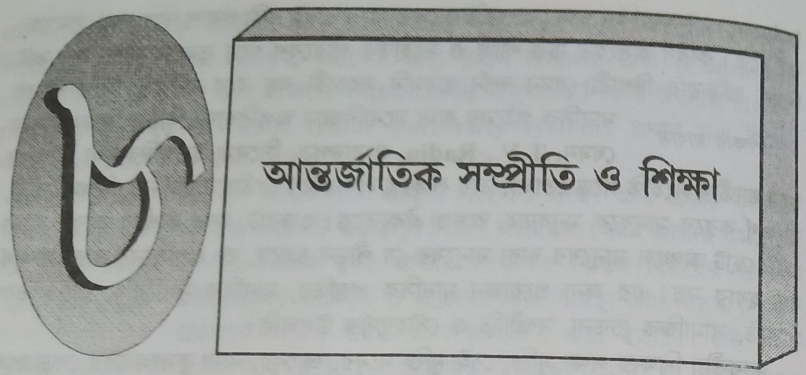

আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি ও শিক্ষা

একবিংশ শতক! নানা সম্ভার আজ মানুষের সামনে। জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, প্রযুক্তিতে, শিল্পোন্নয়নে, শিক্ষার বিভিন্ন নিত্য নতুন উদ্ভাবনে, তথ্য সমৃদ্ধিতে, ব্যক্তিমানুষ, গোষ্ঠীমানুষ আজ ধনী! বাইরের উপকরণ তাকে সম্পদে, সম্ভোগে, ব্যক্তিস্বার্থসিদ্ধিতে ভুলিয়ে রেখেছে। কিন্তু মাঝেমাঝেই নিরাপত্তাহীনতার আতঙ্কে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে সে। বাতাসে বারুদের গন্ধ। ধর্মোন্মত্ততা, সর্ববিধ্বংসী সন্ত্রাসবাদ মানুষের রূপেই মানবসভ্যতাকে সম্মুখীন করিয়েছে বুঝি বা অবলুপ্তির পথে। কোন শুভবোধ, সম্প্রীতির ইচ্ছা, মহামনীষীবৃন্দের রেখে যাওয়া জীবন নির্যাস মানুষকে তুলতে পারছে না হিংসা থেকে, আত্মহনন থেকে, ধর্মান্ধতা থেকে, সন্ত্রাসী মনোভাব থেকে। ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনা, ১৩ই ডিসেম্বর, ভারতের গণতন্ত্রহত্যার ষড়যন্ত্র, ইরাক ইরান সংঘর্ষ মানুষের ইচ্ছার ফসল, আর তা মানুষেরই লজ্জার কারণ। ক্রমশ মানুষ একা হয়ে পড়ছে, কারণ সামাজিক নিরাপত্তার ঘেরাটোপে আর সে নেই। কে আশ্বস্ত করবে দুঃস্থ মানুষকে? কে বলবে, 'সবার ওপরে মানুষ সত্য?' কোন্ কবি বলবেন, 'অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো।' আর্তমানুষের কোন্ পরিত্রাতা বলবেন, 'Love thy neighbour! **Comenius** ১৬৪৩ সালে, আজ থেকে প্রায়ে সাড়ে তিনশো বছর আগে উপলব্ধি করেছিলেন যে সত্য, তা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। তিনি বললেন, ''There is needed even today an immediate remedy from the frenzy which has seized many men and is driving them in their madness to their mutual destruction. For we witness throughout the world disastrous and destructive flames and discords devastating kingdoms and peoples with such persistence that all men seem to have conspired for their mutual ruin which will end only with the destruction of themselves and the universe. Nothing is, therefore, more necessary for the stability of the world, if it is not to perish completely, than some universal rededication of minds, universal peace and harmony must be secured for the whole human race. By peace and harmony, however, I mean not external peace between rulers and peoples among themselves but an internal peace of minds inspired by a system of ideas and

আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি বিপন্ন

Comenius

feelings. If this could be attained the human race has a passion of great promise." সংক্ষিপ্তাকারে এই বক্তব্যের নির্যাস হ'ল—"মানুষ যেন ষড়যন্ত্র করেছে আত্মহননের। সর্ববিধ্বংসী হিংসার আগুন চারিদিকে। মনে হচ্ছে মানবসভ্যতা বুঝি অবলুপ্তির পথে। এর থেকে পরিত্রাণের পথ হ'ল শান্তি ও সংহতির লক্ষ্যে মানুষের মানসিক অবদান। শান্তি, সংহতি বাইরের জিনিস নয়, এগুলির স্থান অন্তরে, প্রকৃত শান্তি গড়ে ওঠে বোধে, উপলব্ধিতে, কিছু ধ্যানধারণার সংগঠনে। তখনই বিশ্ব মানব জাতির সম্পদ উদ্‌ঘাটিত হবে।"

আন্তর্জাতিকতা প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়—জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতা কি পরস্পরবিরোধী, না পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে প্রথমেই আমাদের মনে আসবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের এ বিষয়ে সুচিন্তিত মতাদর্শ। জাতীয়তাবাদ যেমন শিক্ষা, সংস্কৃতির ফসল, তেমনি আন্তর্জাতিকতার জন্মও মানুষের ধ্যানধারণা ভাবনার, মননের জগতের ওপর ভিত্তি ক'রে। এ বিষয়ে একটু অনুধাবন করলেই দেখা যায় যে মানুষের মন কিন্তু অবিভাজ্য এবং অখণ্ড। মানুষের সত্তার একটা দিক যেমন তার ব্যক্তিজীবন, আর একটা দিক সমাজ জীবন, ঠিক তেমনি মানুষের সত্তার একদিককে বলতে পারি তার জাতীয় সত্তা, অন্য দিককে বলতে পারি তার মানবিক সত্তা। ব্যক্তিজীবনে, মানুষের এক পরিচয়, সমাজ জীবনে সেই মানুষেরই অন্যতর পরিচয়। এই দুই পরিচয়ে কোনো বিরোধ নেই। জাতীয় শিক্ষা ও আন্তর্জাতিক শিক্ষা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে সেই সত্যটিকে তুলে ধরলেন যে ভারতীয়ের পক্ষে সেই শিক্ষাই যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা যা একই সঙ্গে তাকে ভারতীয় করে ও মানুষ করে। তিনি বললেন যে জাতীয় শিক্ষা দোষাবহ নয়, অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কিন্তু অসম্পূর্ণ। আন্তর্জাতিক বা সার্বভৌম শিক্ষা তার পরিপূরক। শিক্ষার মাধ্যমে বহু জাতির মিলনের ক্ষেত্রটি রবীন্দ্রনাথ প্রস্তুত করলেন, আর সেই আদর্শে নামাঙ্কিত হ'ল ''বিশ্বভারতী''—''যত্র বিশ্বম্ ভবত্যেক নীড়ম্।'' সমস্ত বিশ্ববিদ্যা এখানে এসে মিলিত হবে—তাই বিশ্বভারতীর লক্ষ্য। তিনি বললেন, ''The feeling that Santiniketan should be placed above and beyond all geographical limitations, has been long in my mind : The victory banner of universal man will be unfurled there. To break through the python cils of nationalistic snobbery shall be the work of my last years..... On the high-way of the Man-god we shall be singing the song of super manhood. The road of that great world we shall consider as our country.'' এই বক্তব্যের নির্যাস হ'ল—সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ থেকে মুক্ত হয়ে আন্তর্জাতিক মানুষটি বেরিয়ে আসবে। শান্তিনিকেতনে সেই ক্ষেত্রটিকে প্রস্তুত করাই ছিল কবির শেষজীবনের লক্ষ্য।

জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতা

বিশ্বভারতী

এখন ব্যাখ্যা করা যাক্ আন্তর্জাতিকতা বলতে কী বুঝি ও শিক্ষা-সংস্কৃতির বিস্তার কীভাবে এই মহান্ আদর্শকে ফলপ্রসূ করে তুলতে পারে। আজকের মানবজীবনের নিরাপত্তাহীনতার প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার মত জরুরী বিষয় বুঝি আর কিছু নেই।

আন্তর্জাতিকতা গড়ে ওঠার উপাদানগুলি হ'ল—বিশ্ব নাগরিকত্ব, বিশ্ব সামাজিকতা,

সংকল্পের প্রথমেই আসে বাক্যসংযম, তাই তৃতীয় মার্গ হ'ল (৩) সম্যক বাক্। মিথ্যা ভাষণ, অপ্রিয় কথা, পরনিন্দা ও অতিকথন থেকে নিজেকে সংবৃত করতে হবে। সম্যক বাক্ হলেই চলবে না, সাধককে সদাচারী হতে হবে। তাই চতুর্থ মার্গ হ'ল (৪) **সম্যক্ কর্মান্ত। সদাচার বলতে অহিংসা, অস্তেয়** বা **অচৌর্য** এবং অবৈধ ইন্দ্রিয়সম্ভোগ থেকে নিরত থাকা বোঝায়। সম্যক্ সঙ্কল্প ব্রতী হয়ে সদালাপী, সদাচারী মুমুক্ষুব্যক্তি জীবন ধারণের জন্য কখনও অসৎ উপায় অবলম্বন করবে না। এই পথটির নাম **সম্যক আজীব**, এটি ৫ম মার্গ। ৬ষ্ঠ মার্গটি হ'ল **সম্যক ব্যায়াম** এই ব্যায়ামটি মানসিক। আমরা জানি মন কখনও শূন্য থাকে না। তাই সাধককে এই মনটিকে সবসময় সৎচিন্তায় পরিপূর্ণ রাখতে হবে। অসৎ চিন্তা, নেতিবাচক ভাবনা দূর করে সৎ চিন্তাভাবনার স্থায়ী আসন মনে গড়ে তুলতে হবে। সপ্তম মার্গটি হ'ল (৭) **সম্যক্ স্মৃতি**। মুমুক্ষু ব্যক্তিকে এই চারটি সত্য মনে ধরে রাখতে হবে, আর মনে করতে হবে এই জগতের যা কিছু সবই অনিত্য ও বিকারশীল, তাই সমস্ত কামনা বাসনা থেকে মুক্ত রাখতে হবে নিজেকে। এই ৭টি পথ অতিক্রম করে মানুষ শেষ ধাপটিতে পৌঁছায়, সেটি হ'ল **সমাধি**, এই ধাপটি শেষ ও **অষ্টম**। এই সমাধি লাভেরও কয়েকটি স্তর আছে, স্তরগুলি অতিক্রম ক'রে মুমুক্ষু সেই আত্ম সমাহিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। বুদ্ধদেব বলেছেন—বুদ্ধ (Enlightened) একটি অবস্থামাত্র। বৌদ্ধমতবাদের চারটি পরাসত্য, সেই সূত্রে প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব ও নীতিশাস্ত্র এতক্ষণ আলোচনা করলাম। এই তত্ত্বগুলির ফসল আরও দুটি বৌদ্ধপ্রধান মতবাদ—এই দুটি হ'ল **অনিত্যবাদ (Transitoriness),** যার থেকে জন্ম **ক্ষণভঙ্গবাদ** আর অনাত্ম্যবাদ। অনিত্যবাদ মতে কোন কিছুই কখনও স্থির নয়, সবসময় ভাঙাগড়া চলছে, ক্ষণে ক্ষণে সবকিছুর পট বদল। স্থায়ী কিছু নেই। **অনাত্ম্যবাদকেও** এই ভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়। বৌদ্ধমতে আত্মা অবিনশ্বর নয়—, আত্মা হ'ল চেতনাস্রোতের নিরন্তর প্রবাহ—যা কখনও থেমে নেই, বয়ে চলেছে নদীর তরঙ্গমালার মত। তবে এই আত্মরূপ তরঙ্গমালা অবিচ্ছিন্নধারা। বৌদ্ধ মতে, মানুষ দেহ, মন ও চেতনার একটি অনিত্য সমাহার। যখন দেহ মন চেতনা যুক্ত হচ্ছে তখন তার সৃষ্টি, আর বিনাশের সময়ে এগুলি বিচ্ছিন্ন হয়। মানব অস্তিত্বকে পুদ্‌গল রূপে বৌদ্ধরা ব্যাখ্যা করেছেন, যা পাঁচটি স্কন্ধের সমাহার। এগুলি হ'ল (১) রূপস্কন্ধ অর্থাৎ বস্তুর (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু) সংযোগ, (২) বেদনাস্কন্ধ, অর্থাৎ সুখ, দুঃখ, বেদনারূপ অনুভূতির যোগফল, (৩) সংজ্ঞাস্কন্ধ—ধারণার সমষ্টি, (৪) সংস্কারস্কন্ধ, প্রবৃত্তি প্রভৃতি আন্তর বিষয়ের যোগফল, আর (৫) বিজ্ঞানস্কন্ধ—চেতনার সমাহার। প্রথমটি ছাড়া আর সবই মানসিক। তাহলে ব্যক্তিত্ব আর কিছুই নয়, নানা কিছু যোগেরও যোগফল। এই পাঁচটির সমাহার হ'ল—**নামরূপ**।

সম্যক সংকল্প
সম্যক্ বাক্
সম্যক্ কর্মান্ত
সম্যক্ আজীব
সম্যক্ স্মৃতি
সম্যক্ সমাধি
বুদ্ধ-একটি অবস্থা
অনিত্যবাদ
ক্ষণভঙ্গবাদ
অনাত্ম্যবাদ
মানুষের ব্যক্তিত্ব কয়েকটি স্কন্ধের সমাহার—(১) রূপস্কন্ধ (২) বেদনাস্কন্ধ (৩) সংজ্ঞাস্কন্ধ (৪) সংস্কারস্কন্ধ, (৫) বিজ্ঞানস্কন্ধ

➢ বৌদ্ধদর্শনে জ্ঞানতত্ত্ব (Epistemology) ≺

বৌদ্ধদর্শন অবৈদিক শাখা। প্রয়োগবাদ ও বাস্তববাদ এই দর্শনের ভিত্তিভূমি। প্রমা বা জ্ঞান সব কিছুর প্রধান উপাদান— এ কথা বিভিন্নভাবে তাঁরা প্রচার করেছেন। এই প্রমা বা জ্ঞানলাভের উৎস বলতে বৌদ্ধ সম্প্রদায় **প্রত্যক্ষ (perception)** এবং **অনুমান (Inference)** কে গ্রহণ করছেন। বৌদ্ধদের মতে নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ (Indeterminate perception), যাতে বস্তু বা বিষয়ের স্বরূপ বা নির্যাস (essence)টি উপলব্ধ হয়, তাই আসল প্রমা। তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ সম্ভব নয়, তখন সবিকল্প প্রত্যক্ষই প্রমাণ হিসাবে গৃহীতব্য। অনুমানও যখন সবিকল্প প্রত্যক্ষ-নির্ভর, তখনই লোক-ব্যবহারে প্রয়োগ করা চলে। সবিকল্প প্রত্যক্ষ বস্তুটির বিশিষ্টতাকে গ্রহণ করে, অর্থাৎ, এর নাম ও কোন্ জাতির এটি অন্তর্ভুক্ত এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়। যেমন, আগুন দাহিকাশক্তিবিশিষ্ট—সবক্ষেত্রেই আগুনের কাজ একই—এই জ্ঞান সবিকল্প প্রত্যক্ষগোচর, আর এর অমূর্ত জ্ঞান (abstract knowledge) নির্বিকল্প।

প্রমাণ হ'ল দুটি—প্রত্যক্ষ ও অনুমান
প্রত্যক্ষ (ক) নির্বিকল্প (খ) সবিকল্প

এখন আমরা বৌদ্ধ জ্ঞানতত্ত্বে মনের স্বরূপ, এবং মনের সাহায্যে কেমন করে জানা সম্ভব হয়, তাই সংক্ষেপে আলোচনা করব। **অস্তিত্ব** বা **Being থেকে মনটিকে আমরা পাই**। গভীর নিদ্রায় যে মনটি রয়েছে, তা **বীথিমুক্তচিত্ত**। আমাদের এই অস্তিত্ব আর চিন্তার মাঝখানে যে একটি আড়াল তাকে বলা হয় **ভবঙ্গুপচ্ছেদ**, তাই হ'ল মনের চৌকাট বা মনোদ্বার। মনের নানান গুণ, তারা ভাল ও মন্দে বিভক্ত। আবার এই **ভালমন্দ— প্রত্যেকেই দুধরনের—সার্বজনীন** (Universal) এবং **বিশেষ** (Particular)। মনের সাতটি সার্বজনীন ভাল গুণ হ'ল — **স্পর্শ, বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, একাগ্রতা, জীবিতিন্দ্রিয়** ও **মনোসিকার** অর্থাৎ মনোযোগ। স্পর্শমাধ্যমে রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ বিশিষ্ট বিষয়ের সঙ্গে মনের প্রথম সংঘাত বা যোগ **বেদনার** মাধ্যমে অনুভূতি জাগ্রত হয়, **সংজ্ঞায়** কিছু ধারণা জন্মায়, **চেতনায়** উপযুক্ত পরিবেশ রচিত হ'লে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব, **একাগ্রতায়** একটি বিষয়ের সঙ্গে ব্যক্তির সামগ্রিক সম্পর্ক রচিত হয়, **জীবিতিন্দ্রিয়** এই মানসিক স্তরগুলির যোগফল, **মনোসিকার হ'ল** বিশেষ বিষয়ের প্রতি মনোযোগের প্রক্রিয়া। বৌদ্ধদর্শনে মনকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সমাহার হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বৌদ্ধদর্শন কয়েকটি **সুস্থ মানসিক গুণের বিশ্লেষণ করেছেন**, যেমন, প্রথম, **বিতর্ক**, অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি উপাদানগুলিকে হাজির করা, দ্বিতীয়, **বিচার**, অর্থাৎ, মনকে বিষয়াভিমুখী করার জন্য মনের সঞ্চালন, তৃতীয়, **অধিমোক্ষ**, অর্থাৎ কোন্ বিষয়ের প্রতি মনকে নিযুক্ত করা যায়, তা বেছে নেওয়া, চতুর্থ, **বীর্য**, অর্থাৎ কর্মের প্রতি উদ্দীপনা, পঞ্চম, **পীতি** অর্থাৎ বিষয়ে আগ্রহ, আর ৬ষ্ঠ হ'ল **চন্দ**, অর্থাৎ, বিষয় বা বস্তু অনুযায়ী কর্মের ইচ্ছা।

গভীর নিদ্রায় যে মনকে পাই তা বীথিমুক্তচিত্ত
ভবঙ্গুপচ্ছেদে মনের চৌকাট
মনের ৭টি ভাল গুণ—স্পর্শ, বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, একাগ্রতা, জীবিতিন্দ্রিয় ও মনোসিকার
মনের প্রক্রিয়া (১) বিতর্ক (২) বিচার (৩) অধিমোক্ষ (৪) বীর্য (৫) পীতি (৬) চন্দ

শব্দ ঃ সাংখ্য মতে শব্দ আর একটি প্রমাণ বা প্রমার উৎস। সাংখ্য দার্শনিকেরা বেদ-ভিত্তিক শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না।

শব্দ

সাংখ্যমতে মুক্তি তত্ত্ব ঃ সাংখ্যমতে বিভিন্ন ধরনের দুঃখ থেকে নিষ্কৃতিই মুক্তি। এই দুঃখ থেকে মুক্তিলাভের জন্য যোগদর্শন বিভিন্ন পথের সন্ধান দিয়েছে। পরে আমরা তা আলোচনা করব।

সাংখ্যমতে মুক্তি তত্ত্ব

এতক্ষণ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে আমরা সাংখ্য দর্শনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করলাম। এখন এই বৈশিষ্ট্যগুলির প্রাসঙ্গিকতা আধুনিক মনন জগতে, শিক্ষার তত্ত্বে ও প্রয়োগে কতখানি, তা ভেবে দেখার বিষয় বলে মনে করি।

● আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বে ও প্রয়োগে সাংখ্যদর্শনের মূল বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা ঃ

আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বে শিক্ষার্থীদের মধ্যে **ব্যক্তিমূলক বৈষম্য** (Individual difference) একটি অবশ্যস্বীকার্য সত্য এবং এই মূলনীতিটিকে কেন্দ্র করেই শিক্ষামূলক প্রচেষ্টা গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। সাংখ্যদর্শন আত্মার গুণগত পার্থক্য অনুসারে আত্মার বহুত্ব তত্ত্ব প্রচার করেছে। সাংখ্যের এই তত্ত্বটি সমালোচিত হলেও এর কিছু সত্যতা রয়েছে।

ব্যক্তি বৈষম্য

সাংখ্যদর্শন বিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব যে ভাবে ব্যাখ্যা করেছে তা খুবই বৈজ্ঞানিক। আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক ভাবনার বীজগুলি এর মধ্যে নিহিত রয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান প্রতিটি বস্তুর অস্তিত্বকে **জড় বস্তু ও শক্তির সমন্বয়ে** গঠিত বলে ব্যাখ্যা করে। সাংখ্যতত্ত্বে অচেতন, জড় অথচ সক্রিয় প্রকৃতি যখন চেতন, শক্তি সম্পন্ন, নিষ্ক্রিয় পুরুষের সান্নিধ্যে আসে, তখনই সৃষ্টি সম্ভব। আরও বলা হয়েছে যে সৃষ্টির আগে প্রকৃতির গুণগুলি সাম্যাবস্থায় থাকে, পুরুষ যখন প্রকৃতির সান্নিধ্যে আসে, অর্থাৎ শক্তি (Energy) আর জড়বস্তু (matter) যখন কাছাকাছি আসে, তখনই সাম্যাবস্থা (equilibrium) বিঘ্নিত হয় ও সৃষ্টি শুরু হয়। এই তত্ত্বাংশটির সঙ্গে **Newton-এর গতিতত্ত্বের প্রথম সূত্রটির মিল খুঁজে পাওয়া যায়। Newton-এর গতিতত্ত্বের প্রথম সূত্রটি হ'ল**—'বাইরে থেকে বিচলনের কারণ না এলে কোন বস্তু তা গতিময় হোক্ কি গতিহীন হোক্—তার কোন পরিবর্তন হয় না' (a body in motion or at rest continues to be so unless it is disturbed from outside.)

বস্তু ও শক্তির সংমিশ্রণে সৃষ্টি

সাংখ্য বিবর্তন তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক। প্রথমতঃ, এটি বস্তুর নিত্যতা ও শক্তির নিরন্তর কর্মক্ষমতার ওপর নির্ভর করে। শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত ক্ষমতা, তার কর্মপ্রবণতা শিক্ষা পরিবেশের পরিচালনার ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে। উভয় ক্ষেত্রেই অর্থাৎ **শিক্ষার্থীর প্রকৃতি** (heredity or nature) এবং **শিক্ষার্থীর পরিমণ্ডল** (Environment or Nurture) এদের সক্রিয় প্রতিবর্তক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে **কর্মমুখীনতার** তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায় সাংখ্যদর্শনে। সাংখ্য কার্যকারণতত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছে, সবসময় **কারণের মধ্যে কার্যের সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে। শূন্য থেকে কোন কিছুরই সৃষ্টি হয় না, অর্থাৎ যা আজ ঘটবে তার সম্ভাবনা গতকাল ছিল।** সৃষ্টি প্রক্রিয়া কোন সুপ্ত সম্ভাবনার

সাংখ্য বিবর্তন তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক

কর্মমুখীনতা

কারণের মধ্যে কার্য থাকে

বিবর্তন মাত্র। যা অব্যক্ত ছিল, তা অভিব্যক্ত হয় সৃজন প্রক্রিয়াতে। তাই কোন ব্যক্তির প্রবণতা, ক্ষমতা, রুচি, আগ্রহ অনুসরণ না ক'রে তাকে পরিচালনা করা যায় না। আর বিশ্বসৃষ্টি প্রক্রিয়ার মত প্রতিটি জীবই, বিশেষ করে মানুষ সৃষ্টিশীল (creative)। সৃষ্টিশীলতাহীন এমন কোন ব্যক্তিত্ব কল্পনামাত্র (non-creative person is a figment of imagination)। সৃষ্টির মত ধ্বংসও কোন অবস্থার পরিবর্তন মাত্র। দ্বিতীয়তঃ, এই **বিবর্তন চক্রাকারে চলে,** অর্থাৎ কখনও সৃজন, কখনও তার স্থিতি, কখনও তার অবসান—অর্থাৎ কোথাও কোন আরম্ভ বা শেষ নেই, **সব কিছু গতিময়তায় ভাসমান।** শেষতঃ, এই বিবর্তন প্রক্রিয়া উদ্দেশ্যমুখী এবং এই উদ্দেশ্যের কেন্দ্রবিন্দু হইল ব্যক্তি-সত্ত্বা—তার শ্রেণী (Species) নয়। এই বিবর্তনতত্ত্ব শিক্ষার আধুনিক সংজ্ঞায় গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। আধুনিক শিক্ষার অর্থ হ'ল—এই প্রক্রিয়া গতিশীল আত্মবিকাশ প্রক্রিয়া। **শিক্ষার অর্থই হ'ল আত্মসক্রিয়তা, সৃজনশীলতা ও নিত্য নতুন অভিজ্ঞতার নিরিখে জ্ঞানের পুনর্গঠন ও পুনর্রূপান্তর।** এই গতিময়তার মধ্যে দিয়েই ব্যক্তি, সমাজ, সংস্কৃতি পরিবর্তিত হচ্ছে, পরিবর্ধিত হচ্ছে, রূপান্তরিত হচ্ছে নতুন নতুন আঙ্গিকে।

প্রতিটি জীবন সৃজনশীল

উদ্দেশ্যমুখী

শিক্ষা গতিশীল আত্মবিকাশ প্রক্রিয়া

সাংখ্যসৃষ্টিতত্ত্বে প্রথম উৎপন্ন যেটি, সেটি হ'ল **বুদ্ধি।** এই **বুদ্ধি মননশীল মানুষের প্রধান সম্পদ।** তাই এটির গুরুত্ব অসীম। এই **বুদ্ধি, মন ও অহংকার** এদের কাজ ব্যক্তির অন্তরে। বাইরের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বহির্বস্তুর জ্ঞান আহরণে **মন, বুদ্ধি** ব্যক্তিকে সহায়তা করে। সাংখ্যে কোন বস্তু বা বিষয় জানার প্রক্রিয়ায় যে কতকগুলি নির্দিষ্ট পদক্ষেপ উল্লিখিত হয়েছে, সেগুলি আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে ও মনোবিজ্ঞানে খুবই মূল্যবান। আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানে জানার উৎস হিসাবে **'প্রত্যক্ষ'** একটি বিশাল জায়গা জুড়ে রয়েছে। ইন্দ্রিয় তো জ্ঞান আহরণের দ্বারস্বরূপ। **সাংখ্যমতে ইন্দ্রিয় বস্তুর সংযোগে যে ছাপ তৈরি হয় সেটিকে মন বুদ্ধি পর্যালোচনা করে**— এবং নির্বাচন ও বর্জন (selection and elimination) প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্টতায় উন্নীত হয় ও তখন বস্তু বা বিষয়টির সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানলাভ সম্ভব হয়। এই যে সরল থেকে জটিলে, মূর্ত (concrete) থেকে অমূর্তে (abstract) জ্ঞান আহরণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরবিন্যাস, তা আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানসম্মত। তাই জন্য শিক্ষাবিজ্ঞানে শিশুদের ইন্দ্রিয় সঞ্চালন, ইন্দ্রিয় পরিমার্জনা আবশ্যিক অঙ্গ। ইন্দ্রিয় অনুশীলিত হলে তবেই মনের দরজায় বুদ্ধির আয়নায় তাদের **তথ্যসামগ্রীর** জ্ঞান সৌধ হয়ে গড়ে ওঠে। সাংখ্যমতে **প্রত্যক্ষের দুটি ধরন** একটি নির্বিকল্প, আর একটি সবিকল্প। নির্বিকল্প মনের প্রাক্‌চেতন (preconscious layer of mind) স্তরে স্থান পেয়েছে।

প্রত্যক্ষ

জানার প্রক্রিয়া

প্রত্যক্ষ-দ্বিবিধ— নির্বিকল্প ও সবিকল্প

মনোবিদ্ James-কে অনুসরণ ক'রে নির্বিকল্প প্রত্যক্ষকে আমরা নিছক সংবেদন বলতে পারি। সংবেদন কিন্তু জ্ঞান নয়, সংবেদন হ'ল বস্তুটির সঙ্গে নিছক পরিচয় (acquaintance) আর প্রত্যক্ষ বা সবিকল্প

প্রথমে সংবেদন ও পরে প্রত্যক্ষ

মনের চারটি সার্বজনীন ও দুটি বিশেষ মন্দ গুণের উল্লেখ বৌদ্ধদর্শনে পাওয়া যায়।

মনের সার্বজনীন চারটি ও বিশেষ দুটি মন্দ গুণ

সার্বজনীন মন্দ গুণ বা propertyগুলি হ'ল (১) **মোহ**, (২) **নির্লজ্জতা**, (৩) **অনুতাপের অভাব** ও (৪) **মনোযোগের অভাব**। বিশেষ দুটি হ'ল—(১) **লোভ** ও (২) **ভ্রান্ত ধারণা**।

এখন এই মন কেমন ক'রে বিষয়ের জ্ঞান সংগ্রহ করে তা দেখা যাক। চিন্তার স্তর আছে যাকে বলে চিত্ত নিয়ম। চিন্তা প্রক্রিয়ার আবার তিনটি ক্রম আছে,—উপ্‌পাদ অর্থাৎ চিন্তারম্ভ, পরে থিতি অর্থাৎ বিকাশ, আর ভঙ্গ বা ভেঙ্গে যাওয়া। প্রতি ক্রমের সময় মাত্র মুহূর্তের। কোন বস্তু যখন মনের সামনে আসে, তখন, ব্যক্তির অন্তরে একটি আলোড়ন বা কম্পন শুরু হয়, তখন মন জেগে ওঠে, একে বলে মনোদ্বারা বজ্জন। তখন আসে জবন, যাকে আধুনিক মনোবিজ্ঞান ব্যাখ্যা করেছে apperception বা সংপ্রত্যক্ষরূপে। এই জবন আর কিছুই নয় মনের মধ্যে সঞ্চিত জ্ঞানের সঙ্গে নতুন জ্ঞানের মিলন। ইন্দ্রিয় সংযোগে তা সম্ভব হয়ে ওঠে। **মন বিষয়টি পরীক্ষা করে, তখন বিশেষীকরণ হয়।** এই সময়ে জবন প্রক্রিয়া বা apperceptive process ক্রিয়াশীল হয়, অর্থাৎ জানা সম্ভব হয়। **পরে বিষয় বা বস্তুটি আত্মীকৃত হয় অর্থাৎ তদারম্মন ঘটে।** কম্পন যদি ক্ষীণ হয় তখন জানা সম্ভব নয়। এই প্রক্রিয়ায় শুধু মন ও ইন্দ্রিয় নয় বহির্বিশ্বও যুক্ত। তাই জ্ঞান সম্পূর্ণ মানসিক নয়। শুদ্ধ মানসিক জ্ঞান সম্ভব হয় যখন মন কল্পনায় বা স্বপ্নে বা পুরোনো কোন জ্ঞানের পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে কিছু জানে।

মন কেমন করে জ্ঞান সংগ্রহ করে

চিন্তার স্তর (ক) চিন্তারম্ভ (খ) বিকাশ (গ) ভঙ্গ

মনের কম্পন

জবনকে apperception বা সংপ্রত্যক্ষ বলা হয়

ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের মাধ্যমে কোন বিষয় বা বস্তু কতখানি প্রকাশিত হয়?—এই প্রশ্নটিকে ঘিরে বৌদ্ধদর্শনের বিশেষ **চারটি শাখা** তাঁদের মতামত দিয়েছেন। সেগুলির কেবল উল্লেখ করা হচ্ছে। **বৌদ্ধের মাধ্যমিক শাখা** মনে করেন মানসিক বা মানসবহির্ভূত কোন প্রত্যক্ষই হয় না, কারণ, কোনটিরই অস্তিত্ব নেই, সবই শূন্য। তাই এই শাখার আর একটি নাম শূন্যবাদ (Nihilism)। **দ্বিতীয় শাখার নাম যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদ,** এই মতবাদে ব্যক্তির আন্তর সত্তার অস্তিত্ব অবশ্যই আছে, বাইরের জগৎ মনেরই ধারণার প্রতিফলন (Subjective Idealism)। ব্যক্তির মন সঞ্চিত জ্ঞানের আলয় ও আশ্রয়। এই দর্শনশাখাকে 'আলয়বিজ্ঞান'ও বলা হয়। **তৃতীয় শাখার নাম সৌত্রান্তিক,** এই মতবাদ অনুযায়ী, মনের জগৎ ও বহির্জগৎ, দুটোই সত্য, কিন্তু মনের ধারণা ও বস্তু এক নয়, বস্তুর অনুকৃতি (copies) মাত্র। **চতুর্থ শাখা বৈভাষিক নামে** পরিচিত। সেই মতবাদ মন ও বহির্জগৎ, দুটিকেই সমান সত্যের মর্যাদা দিল। এই মতবাদী আরও বললেন, মন বহির্জগৎ প্রত্যক্ষভাবেই জানতে পারে, অনুমানের মাধ্যমে নয়।

বৌদ্ধদর্শনের শাখা—

(ক) মাধ্যমিক বস্তুর জ্ঞান হয় না

(খ) বিজ্ঞানবাদী বস্তুর জ্ঞান ব্যক্তিমনেরই প্রতিফলন

(গ) সৌত্রান্তিক—মনের জগৎ ও বহির্জগৎ দুটোই সত্য তবে বস্তু অনুকৃতি ধারণা (ঘ) বৈভাষিক মন বস্তুকে প্রত্যক্ষভাবেই জানতে পারে

এতক্ষণ আমরা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে বৌদ্ধদর্শনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করলাম। এখন **শিক্ষাতত্ত্বে ও প্রয়োগে এই বৈশিষ্ট্যগুলি কতখানি প্রাসঙ্গিক,** তা ব্যাখ্যা করে দেখা যাক্।

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই কেমন করে ব্রাহ্মণ্য-উত্তর শিক্ষাদর্শকে বৌদ্ধশিক্ষা প্রভাবিত করেছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতক এক বিশ্বব্যাপী আলোড়নের যুগ। চীনদেশে কনফুসিয়াস, গ্রীসে পিথাগোরাস, ভারতবর্ষে এই আলোড়নের পথিকৃৎ। বুদ্ধের বাণী ঔপনিষদীয় ভাবনার ফসল, কিন্তু এ যেন সে সত্যকে নতুন আলোকপথে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করল। সম্রাট অশোক বুদ্ধের বাণী পৌঁছে দিলেন প্রাচ্যে, পাশ্চাত্যের কিছু কিছু দেশে। **তিব্বত, বর্মা, নেপাল, কম্বোডিয়া, চীন, জাপান,** সর্বত্র এই ভাবনার পদচারণা স্পষ্ট হয়ে উঠল ক্রমে ক্রমে। আমরা **বৌদ্ধদর্শনের ফসল বৌদ্ধশিক্ষা ভাবনা** ও তার প্রায়োগিক দিক নিয়ে আলোচনা করব।

শিক্ষাক্ষেত্রে বৌদ্ধদর্শনের প্রাসঙ্গিকতা

বৌদ্ধদর্শন ও ধর্ম প্রচার

বুদ্ধদেব তাঁর বোধিপ্রাপ্ত যে সত্য প্রচার করেছিলেন, তার নির্যাস হ'ল মানবজীবনের চরমতম লক্ষ্য হ'ল নির্বাণলাভ, এবং স্বাভাবিক ভাবেই সামাজিক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক্‌গুলিকে বিন্যস্ত করা হ'ল ঐ পরালক্ষ্যে। প্রাথমিক ভাবে বুদ্ধদেব উপলব্ধি করেছিলেন, **জাতি-ধর্ম-বর্ণ—আর্থসামাজিক অবস্থা নিরপেক্ষে সবাই সমান।** তাই ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার এই বৈষম্যকে বুদ্ধদেব তীব্র নিন্দা করলেন। দার্শনিক ও ধর্মীয় উপদেশ ছাড়াও তাঁর **শিক্ষাব্যবস্থায় স্থান পেল বিভিন্ন মানবজীবনমুখী ব্যবহারিক পাঠ্যক্রম।** বৌদ্ধ শিক্ষাধারায় মূল বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যশিক্ষার সাদৃশ্য থাকলেও, বৌদ্ধশিক্ষায় গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রকট ছিল।

সবই সমান

শিক্ষা ব্যবস্থায় দর্শন ধর্ম ও ব্যবহারিক পাঠ্যক্রম

বৈদিক ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থার মত বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থাতেও শিক্ষার্থীদের জন্য কয়েকটি আনুষ্ঠানিকতা ছিল। **প্রথম অনুষ্ঠানটির নাম হ'ল প্রব্রজ্যা**—এই সময়ে শিক্ষার্থীকে বিদ্যাগ্রহণের জন্য সঙ্ঘে প্রবেশের অনুমতি পেতে হ'ত। প্রব্রজ্যা ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থার উপনয়নের মত। প্রব্রজ্যা গ্রহণের প্রথম অবস্থায় শিক্ষার্থীকে শ্রমণ বলা হ'ত। আট বছর বয়সের আগে কেউ প্রব্রজ্যায় যেতে পারত না। সঙ্ঘে প্রবেশের কতকগুলি শর্ত ছিল, যেমন, শিক্ষার্থীকে কয়েকটি রোগমুক্ত হতে হবে এবং সে দাসত্ব, ঋণ ও রাজকার্য থেকে মুক্ত হবে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষায় মাত্র উচ্চবর্ণের মানুষ উপনয়নের অধিকারী ছিল। বৌদ্ধশিক্ষায় প্রব্রজ্যার অধিকার জাতি-ধর্ম-বর্ণ-আর্থ-সামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে সবাইকে দেওয়া হ'ত। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষায় যেমন গুরুগৃহ শিক্ষালয় ছিল, এখানে সংঘ বা বিহার ছিল শিক্ষাগ্রহণের পীঠস্থান। বৌদ্ধসন্ন্যাসী ও বৌদ্ধশিক্ষার্থী একসঙ্গে বিহারে বা সঙ্ঘে বাস করত ও পঠনপাঠনে নিরত থাকত। ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ—এই দুই ভাবনার সহাবস্থান এই শিক্ষাব্যবস্থায় ছিল।

প্রথম অনুষ্ঠান প্রব্রজ্যা

সবার জন্য শিক্ষা

সংঘভিত্তিক শিক্ষা

শিক্ষার্থী ২০ বছর বয়সে উপসম্পদা অনুষ্ঠানের অধিকারী হ'ত। এই **উপসম্পদা**